তারই প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাসের চরিত্রে। মানুষের মর্যাদা নিয়ে তিনি দেবতার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চেয়েছিলেন—পারেননি, কারণ এই দেবতারা তো সমাজের সেই অংশের প্রতীক যারা মানুষকে মর্যাদা দেয় না। যারা সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রেখে নিজেদের প্রতিপত্তি কায়েম করতে চায়। পুরাণের শর্ত মেনে ভারতচন্দ্র ব্যাসদেবেকে 'দৈবাহত পুরুষ' করেছেন। কিন্তু কবির মনোগত অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম—তাই তিনি ব্যাসদেবকে উপলক্ষ করে দেবমহিমার নগ্ন রূপটিকে প্রকাশ করে দিয়েছেন—সব ছাপিয়ে তাই সমগ্র ব্যাসপর্বে ব্যাসদেবের এই প্রতিবাদী প্রশ্নই শেষ পর্যন্ত রণিত হতে থাকে: 'কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া?' ব্যাসদেব আগাগোড়া আত্মসচেতন, আত্মসম্মানযুক্ত জ্ঞানী মানুষ হয়ে থাকতে চেয়েছেন—বস্তুত মধ্যযুগীয় গোঁড়ামীর উর্ধ্বে তিনি নিজেকে নিয়ে যেতে পেরেছেন। তাই তিনি হরি থেকে হরে এবং শেষে অন্নদায় যেতে পেরেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাস্তবচেতনাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে তিনি বুঝেছেন যে ক্ষমতাবানের ভজনা করারই যুগ সেটা। তবে ব্যাসের মাধ্যমে ভারতচন্দ্র যেটা বলতে চেয়েছিলেন সেটি বিদ্যাসুন্দর পালার একটি বিষ্ণুপদে উচ্চারিত হয়েছে :

নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা
আমি যে খেলিতে চাহি সে খেলা খেলাও হে।

এটাই তো ছিল ব্যাসদেবের লড়াই।

অপ্রধান চরিত্র

অন্নদামঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডের প্রধান তিনটি চরিত্র নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। অপ্রধান হলেও তিনটি চরিত্র—সতীর মা প্রসূতি, উমার মা মেনকা এবং সতীর পিতা দক্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু/চার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।

॥ প্রসূতি ও মেনকা॥

পুরাণ অনুযায়ী প্রসূতি-কন্যা সতী বিনা আমন্ত্রণে পিতৃগৃহে উপস্থিত হন পিতা দক্ষের যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে, কিন্তু সেখানে পিতা কর্তৃক শিবনিন্দা সহ্য করতে না পেরে যজ্ঞস্থলেই মত্যু বরণ করেন। পরের জন্মে সতী-ই হিমালয়-মেনকার সন্তান উমারূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং শিবের সঙ্গে বিবাহ হয়।

সতীর পিতৃগৃহে আসা কবির বর্ণনায় বিবাহিত বাঙালি-কন্যার পিতৃগৃহে আসার সঙ্গে ই তুলনীয়। প্রসূতিকেও বাঙালি মায়ের আদলে গড়েছেন কবি—অনেকদিন অদর্শনের পর যে মা কন্যাকে দেখে আবেগে উদ্‌বেল হয়ে যান। সতী পিতৃগৃহে এসেছেন কৃষ্ণবর্ণা হয়ে, প্রসূতি আগের রাত্রে সতীর এই মূর্তি স্বপ্নে দেখেছেন—আর দেখেছেন ভবিষ্যতে কী ঘটতে যাচ্ছে তার আভাস। তাই প্রসূতির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে উৎকণ্ঠা আবার সস্নেহ ব্যাকুলতাও :

আহা মরি বাছা সতী কালী হইয়াছে।
ছাড়িবে আমারে বুঝি মনে করিয়াছে॥

প্রসূতি সতীর দেবস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন—কিন্তু তবুও এক বাঙালি মায়ের মতোই প্রসূতি বলেছেন :

জগন্মাতা হয়ে মাতা বলেছ আমায়।
জন্মশোধ খাও কিছু চাহিয়া এ মায়॥

দক্ষের মৃত্যুর পর দক্ষের অন্যায়কে স্বীকার করেও তাঁর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে প্রসূতি বলেন 'ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী'। নারীর এই ট্র্যাজেডি প্রসূতির চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কবি প্রকাশ করেছেন। জায়া এবং জননীরূপে প্রসূতি চরিত্র অল্প পরিসরে বেশ উজ্জ্বল।

এই কাব্যের আর এক দেবী চরিত্র উমা-জননী মেনকা। সতী উমারূপে জন্ম নিলেন হিমালয়-মেনকার গৃহে। নারদ এলেন উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে—স্বভাবতই তাঁরা এই বিবাহে রাজি হয়ে যান। এরপর উমা-জননী মেনকাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবাহ-সভায় স্ত্রী আচারের সময়। মেনকা আগে শিবকে দেখেননি—নারদের কথায় বিবাহে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু বিবাহসভায় বৃদ্ধ ভস্মাচ্ছাদিত শিবকে বর হিসেবে দেখে মেনকা বিরূপ হয়ে ওঠেন। এরপর মেনকার উপস্থিতিতেই শিব উলঙ্গ (নারদের কৌশলে) হয়ে পড়েন। এ সবের প্রতিক্রিয়ায় মেনকা প্রায় প্রাকৃত নারীর মতোই ভাষা প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবতই প্রথম কোপটি পড়েছে নারদের ওপর :

ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদ অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

এরপর হিমালয় দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি মেনকার টার্গেট হয়েছেন স্বাভাবিক ভাবেই :

বুড়া হয়ে পাগল হয়েছে গিরিরাজ।
নারদার কথায় করিল হেন কাজ॥

স্বামীকে দায়ী করার সময় মেনকার বোধহয় মনে ছিলনা যে উমার সঙ্গে শিবের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে যখন নারদ হিমালয়ে উপস্থিত হন তখন তিনিও 'সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন (নারদের) পদ।' আসলে কোন কাজের ফল আশানুরূপ না হলে পতিব ওপর দোষ (যদিও সিদ্ধান্ত নেওয়া ব্যাপারটি দুজনেরই থাকে) চাপিয়ে দেওয়া নারীব একটি প্রবণতা। মেনকার চরিত্রেও আমরা এই প্রবণতা লক্ষ করলাম।

এই দুই জননী চরিত্র আমাদের খুব চেনা—বাঙালি ঘরের মা-রূপেই এঁদের এঁকেছেন কবি। এই মায়ের ছবি আমরা শাক্ত পদাবলীতেও পেয়েছি। এঁদের মধ্যে দিযে সে-যুগের বাঙালি পরিবারের কন্যাস্নেহতুরা সমস্ত জননীর মর্মবেদনা কবি রূপায়িত করেছেন।

॥ দক্ষ : সতীর পিতা ॥

দক্ষ আমাদের সহানুভূতি-বঞ্চিত--এর দুটি কারণ, শিব-বিরোধিতা ও দ্বিতীয়ত সতীর মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠা। কিন্তু ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় দক্ষের প্রতি কিছুটা সহানুভূতি জানানোর অবকাশ বোধহয় থেকেই যায়। যজ্ঞসভায় সতীকে দেখে দক্ষ জামাই শিবের নিন্দায় মুখর হয়েছেন সতীর উপস্থিতিতেই—যেটা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। আসলে এখানে সতীর পিতা হিসেবে নয়—এক উদ্ধত, অহংকারী, ক্ষমতাবান ব্যক্তি রূপে দক্ষ নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। তাই তাঁব মুখে শোনা যায় :

বিধবা যখন হইবি তখন
অন্নবস্ত্র তোরে দিব।
সে পাপ থাকিতে নারিব রাখিতে
তার মুখ না দেখিব॥

কিন্তু এর আগে দক্ষের উচ্চারণে একজন পিতার কণ্ঠস্বর শোনা গেল ;

সতী ঝি আমার বিদ্যুত আকার
বাতুলের হৈল জায়া

আমি অভাজন পরম ভাজন
ঘটক নারদ ভায়া।।
আহা মবি সতি কি দেখি দুর্গতি
অন্ন বিনা হৈলা কালি।
তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমরা রহিল গালি।।

এখানে কন্যার দুরবস্থায় এক পিতার আক্ষেপই যেন বর্ণিত। নারদের কথায় পাত্র না দেখেই তিনি শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভাবেননি যে অন্নের অভাবে সতীর দেহ কালিবর্ণ হবে, বস্ত্রের অভাবে বাঘছাল পড়তে হবে এবং এ-সবের জন্যে নিজেকেই দায়ী করেছেন। দক্ষের এই অসহায় উক্তি সে-যুগের অসহায় পিতাদের—যাঁরা উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যাকে পাত্রস্থ করতে পারতেন না তাদের কথাই মনে করায়।

অন্যান্য অপ্রধান দেব চরিত্রের মধ্যে **লক্ষ্মী, গঙ্গা** প্রমুখেরা প্রত্যেকেই অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগবৈশিষ্ট্যের ফসল। তাই গঙ্গা দেবী হয়ে অত্যন্ত অশালীনভাবে প্রাকৃত ভাষায় ব্যাসের সঙ্গে কলহ কবতে পারেন। লক্ষ্মী আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্নাভাবের দিকটিকেই প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্মীর কাছেও শিব ভিক্ষা চেয়ে অন্ন পাননি। আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্ষমতার খেলা চলছিল। ক্ষমতাবানের কৃপা না থাকলে সে-সময়ে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না। লক্ষ্মীর প্রতীকে কবি এই সত্যই প্রকাশ করেছেন। অন্নপূর্ণা পৃথিবীর সব অন্ন কৈলাসে জমা করেছেন—লক্ষ্মীর ঘরেও তাই অন্ন নেই। নিজের অসহায়তার কথা স্বীকার করে লক্ষ্মী জানাচ্ছেন :

কহে শুন গৌরীপতী
কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি।

দেবী লক্ষ্মীও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগ-মহিমায় অবস্থার শিকার।

গৌরীর সখী **জয়া** এক বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্না বাঙালি নারী। তিনি পরামর্শ দেন গৌরীকে কিভাবে শিবকে ফিরিয়ে আনতে হবে। শিবের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে গৌরী পুত্রদের নিয়ে পিতৃগৃহে যেতে চাইলে এই সংসার-অভিজ্ঞা নারীটি তাঁকে নিবৃত্ত করেন। বিবাহিত-কন্যা (পিতা-মাতার স্নেহ সত্ত্বেও) পিতৃগৃহে বেশিদিন সম্মান নিয়ে থাকতে পারে না। প্রথমত ভাই-এর বৌ ব্যাপারটি ভালভাবে মেনে নেয় না—এমন কি বাবা মাও একসময় নিস্পৃহ হয়ে যান। গৌরীর সমব্যাথী সখী হিসেবে পিতৃগৃহে গমনোদ্যতা গৌরীকে তাই নিষেধ করেন বাপের বাড়ি যেতে :

জননীর আসে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া।।

এইভাবে দেবখণ্ডের নানা চরিত্র তাঁদের বিচিত্র কার্যকলাপের দ্বারা *অন্নদামঙ্গল* কাব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। অবশ্য দেবখণ্ডের চরিত্র হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের দেবমহিমা অক্ষুণ্ণ থাকেনি। শিবকে তো অনেক ক্ষেত্রেই হাস্যাস্পদ করে তোলা হয়েছে। আসলে এঁরা সকলেই অষ্টাদশ শতকের যুগ-চিহ্ন বহন করায় কারও দেব-মহিমা অটুট থাকে

নি। প্রচ্ছন্নভাবে দেবমহিমা আরোপের একটা চেষ্টা সব সময় ছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা প্রচ্ছন্নই থেকে গেছে। তবে যে-কথাটি মানতেই হয় তা হল ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্বের কারণে এঁরা কেউ-ই বোধহয় পুরোপুরি 'type'-চরিত্রে পরিণত হন নি।

নরখণ্ডের চরিত্র

॥ হরিহোড়-সোহাগী॥

প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয় কোন দেব-দেবীর পুজো মর্ত্যে প্রচলিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। যার জন্যে স্বর্গের দেবতা শাপভ্রষ্ট হয়ে মর্ত্যে নেমে আসেন এবং পুজো প্রচলন করে শাপমুক্ত হয়ে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান। অন্নদামঙ্গল-ও তার ব্যতিক্রম নয়। কুবের-অনুচর বসুন্ধর অন্নদাপুজোর জন্যে ফুল তুলছিল। কিন্তু চয়িত ফুলের মালা নিয়ে দেবী-পুজোর পরিবর্তে স্ত্রী বসুন্ধরার সঙ্গে রতিরঙ্গে মেতে ওঠায় অন্নদার অভিশাপে হরিহোড় নামে মর্ত্যে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। এবার যথারীতি মঙ্গলকাব্যধারার ঐতিহ্য মেনে হরিহোড়কে বরদানের পালা—দেবীর আশীর্বাদে হরিহোড় দারিদ্র্যমুক্ত হল।

দরিদ্র হরিহোড়ের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের এক সরল নির্লোভ মানুষকে খুঁজে পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত অন্নপূর্ণা হরিহোড়ের কাছে নিজের স্বরূপ প্রকাশ করেন ('হাসিয়া কহেন দেবী দেখরে চাহিয়া। বসিলেন অন্নপূর্ণা মূরতি ধরিয়া॥ মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে। দুই হাতে পানপাত্র রত্নহাতা লয়ে॥ কোটি শশী জিনি মুখ অর্দ্ধ শশী ভালে। শিরে রত্নমুকুট কবরী কেশজালে॥'—মনে পড়তে পারে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী চণ্ডীর কালকেতু-ফুল্লরার সামনে আত্মপ্রকাশের প্রসঙ্গ)। দেবীকে স্বরূপে দেখে হরিহোড় মূর্ছিত হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরলে হরিহোড় দেবীকে সম্বোধন করে বলে :

হরিহোড় বলে মা গো ধনে কাজ কিবা।
এই বর দেহ পাদপদ্মে ঠাঁই দিবা॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর সংশয়ের আবহে দেবতার প্রতি এই আস্থা কবির মধ্যে যে আস্তিক সত্তা ছিল তারই পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। হরিহোড়ের ভক্তিপ্রাণতার সঙ্গে এক নির্লোভ মানুষের (সে যুগে যা দুর্লভ বললেই হয়) চিত্র পাঠকের সামনে ধরে দিয়েছেন কবি। হরিহোড় তাই অযাচিত ভাবে পাওয়া ঐশ্বর্যের দাতার স্বরূপ জানতে চায়—দেবী অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেন : 'হাসিয়া কহিলা দেবী সে হবে শেষে। কিছুদিন সুখ ভোগ করহ বিশেষে॥' এখানে কর্মশেষে—মর্ত্যে দেবীর পুজো প্রচলনের পর হরিহোড়ের পুনরায় স্বর্গে ফিরে যাবার ইঙ্গিত দিয়েছেন দেবী। কিন্তু ভারতচন্দ্র ছাড়বেন কেন—তিনি হরিহোড়কে দিয়ে বলিয়ে নিলেন :

চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলা সমান॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুন বিলম্ব না সহে॥
তবে লব ধন আগে দেহ এই বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে একেবারে নির্ভেজাল ভক্তিপ্রাণতা সম্ভব ছিল না, তাই ভারতচন্দ্র হরিহোড়ের মনের ক্ষীণ সংশয়টুকুকে কৌশলে প্রকাশ্যে আনলেন—আর তাতে চরিত্রটিও

বাস্তব হয়ে ওঠার অবকাশ পেল। হরিহোড় চরিত্র অবলম্বনে সমাজের বাস্তব চেহারাটি অন্যভাবেও দেখালেন ভারতচন্দ্র। ভারতচন্দ্র জানাচ্ছেন দেবীর কৃপায় হরিহোড়ের 'কোঠা' হয়েছে—আর বিপুল ধনের অধিকারী হওয়ার সংবাদে হরিহোড় ঘোষ বসু মিত্র—তিন মুখ্য কুলীনের কন্যাকে ভার্যা হিসেবে লাভ করেছেন। ধনলাভের পূর্বে কায়স্থ সমাজে তাঁর কোন মূল্যই ছিল না। এইভাবে হরিহোড় চরিত্রাঙ্কনের মধ্যে দিয়ে সমাজের বাস্তব চেহারাটি দেখিয়ে দিলেন ভাবতচন্দ্র।

এবার সোহাগীর কথা একটু বলতে হয়। অভিশাপসহ বসুন্ধর তো মর্ত্যে এলেন, বিয়েও করলেন তিন কুলীন কন্যার সঙ্গে। স্বভাবতই বসুন্ধরার দুঃখ পাওয়ার কথা—দুঃখ প্রকাশও করে ফেললেন অন্নদার কাছে :

আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া॥
স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া॥

অতএব বসুন্ধরা বসুন্ধরের মর্ত্য-মানবী সোহাগীরূপে জন্ম নিল কোন্দল-স্বভাবের নারী ধূমীর গর্ভে। অন্নদামঙ্গল রচনার আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্নপূর্ণাকে উপলক্ষ করে কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের প্রশস্তি রচনা। এর জন্যে হরিহোড়ের গৃহ ছেড়ে অন্নপূর্ণাকে ভবানন্দের গৃহে যেতে হয়। দেবীর সখী জয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমতী—তিনিই হরিহোড়কে ছেড়ে যাওয়ার উপায় খুঁজে বার করলেন। যে-গৃহে অশান্তি থাকেঅন্নপূর্ণা সেখানে থাকেন না—হরিহোড়ের গৃহে অশান্তির সৃষ্টি হল চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে সোহাগী আসার পর। যে-নারী স্বর্গে বসুন্ধরকে রতিসুখ দিয়েছিল তার পক্ষে মর্ত্যে তার স্বামী তিন স্ত্রী নিয়ে সুখে জীবন যাপন করছে—এমন দৃশ্য দেখা কষ্টকর—স্বভাবতই তা ঈর্ষার জন্ম দেয়। আর ঈর্ষা থেকে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। ভাবতচন্দ্র তাই সোহাগীকে কোন্দল-পরায়ণা নারী রূপেই সৃষ্টি করলেন। সোহাগীর মা ভাঁড় দত্তের বংশের পুরুষ ঠক ঝাড়ু দত্তের স্ত্রী—'ধূমী নামে তার নারী বড় কন্দলিয়া'। এ হেন মায়েব কন্যা 'সোহাগী' স্বামীগৃহে এল—সঙ্গে এল লকলকি নামে দাসী—সোনায় সোহাগা। সোহাগী আর 'লকলকি' দাসী মিলেমিশে হরিহোড়ের গৃহকে নরকে পরিণত করলে .

কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর॥
....
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে॥

চলে যাবার জন্যে একটা ছল তো চাই। অন্নপূর্ণা এ-বিষয়ে পুরোপুরি যুগের প্রতীক। তিনি হরিহোড়ের কন্যা হয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন। আগের দিন জামাই এসেছে কন্যাকে নিয়ে যাবার জন্যে। স্বভাবতই কন্যা চলে যাবে বলে হরিহোড়ের মন ভাল ছিলনা। এমন একটি ক্ষণ বেছে নিয়ে অন্নপূর্ণা :

অন্নপূর্ণা (কন্যার রূপ ধরে) বিদায় চাহিল সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে॥
ওই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুমদার ঘরে॥

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কন্যাকে দেখে হরিহোড় বুঝলেন ছলনা করে দেবী বিদায় নিয়েছেন—তখন হরিহোড়—

অন্নদা ছাড়িলা বলি শরীর ছাড়িল॥

....

সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।
স্বর্গে গেল বসুন্ধর বসুন্ধরা হয়ে॥

মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যকে এভাবেই কবি *অন্নদামঙ্গল*-এ জুড়ে দিলেন। তবে সোহাগীর চরিত্রে স্বাতন্ত্র্যের নিদর্শন রেখেছেন কবি। হরিহোড় সোহাগীর সহমরণ আমাদের সচেতন করিয়ে দেয় যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল। তাছাড়া এই শতকের আগে রচিত মঙ্গলকাব্যসমূহে মঙ্গলকাব্যের চবিত্র রূপে শাপগ্রস্ত দেবতারা (নারী পুরুষ উভয়েই) মর্ত্যের পালা সাঙ্গ করে পুনরায় স্বর্গে ফিরেছেন—কিন্তু কোথাও সহমরণের প্রসঙ্গ উঠে আসেনি।

দ্বিতীয়ত ঘরে সতীন থাকলে কোন্দল যে অবশ্যম্ভাবী তা সোহাগীর আগমনেই প্রমাণিত হল। সোহাগীর মধ্যে দিয়ে 'বৃদ্ধস্য তরুণীভার্যা'-র সুবিধে-অসুবিধে দুই-ই কৌতুকের সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কবি।

তৃতীয়ত যে-পুরুষকে (বসুন্ধর) রতিসুখ দিতে গিয়ে বসুন্ধরা স্বামীহারা হন তাঁকে মর্ত্যে অন্য স্ত্রীব সঙ্গে সুখে কাল কাটাতে দেখে বসুন্ধরার ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক। সোহাগীরূপে জন্ম নিয়ে তাই তাঁর কার্যকলাপ যথেষ্ট বাস্তব—ভারতচন্দ্রের দক্ষ কলম সেই বাস্তবকে রূপায়িত করেছে। ভারতচন্দ্রের চরিত্র পরিকল্পনায় এইভাবে সোহাগী এক অন্য নারী হয়ে উঠেছেন—মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই।

॥ নলকুবর-পদ্মিনী-চন্দ্রিণী • ভবানন্দ-চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখী॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যেব প্রথম খণ্ডে এঁদের চবিত্রের পূর্ণ বিকাশ হয নি। কাবণ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দকে নিয়ে কবি স্বতন্ত্র খণ্ড রচনা করেছেন—এখানে কেবল ভূমিকাটুকু করে রাখলেন। তবুও স্বল্প পরিসরে নলকুবর চরিত্রে অষ্টাদশ শতাব্দীব অবক্ষয়িত জীবনযাত্রার ছবিটি একেবারে অনাবৃত করে কবি দেখালেন। যুবতীসঙ্গে কামবিহারে মত্ত নলকুবরকে ব্রাহ্মণ বেশী অন্নদা স্মরণ করিয়ে দিলেন এ-সময় রতিবিহারের সময় নয়—অন্নদা পুজোর তিথি। উত্তরে নলকুবর বলেছে ;

এ নব বয়সে ছাড়িয়া এ রসে
কার পূজা করে কেটা॥

....

এ রস ছাড়িয়া পূজায় বসিয়া
ধ্যানে রব যেন বক॥

এরপরে জানিয়েছে :

জানি অন্নদারে সে জানে আমারে
কি হবে পূজিলে তারে।
অন্নদা যেমন কতেক তেমন
আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥

আছয়ে মোর ভাণ্ডারে॥

ভয়ঙ্কর কথা—কিন্তু যুগের পরিচয়বাহী অষ্টাদশ শতাব্দীর রুচিহীন প্রাকৃত জীবনযাত্রার ছবিটি কবি নলকুবরের চরিত্রের আচরণ ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় দেবীর ভূমিকাটিও বেশ প্রাকৃত। তিনি দেব মহিমা ভুলে ডাকিনী যোগিনী শাঁখিনী পেতিনী-কে আদেশ দিলেন নলকুবরকে ধরে আনতে। সেই কাজ সমাধা হলে অভিশপ্ত নলকুবর ভবানন্দ হয়ে মর্ত্যে জন্মালেন—যাঁর গৃহে দেবী অধিষ্ঠান করবেন। দেবীর কৃপাধন্য ভবানন্দ মজুমদার কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ। দেবীকে ভবানন্দের গৃহে অধিষ্ঠিত করে কবি তাঁর দায় চোকালেন।

॥ ঈশ্বরী পাটুনী॥

শঙ্করীপ্রসাদ বসু *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন : "বিরল ক্ষেত্রে কাব্যের শেষাংশ কাব্যের শ্রেষ্ঠাংশ হয়। এখানে তাই হয়েছে।" দুটি কারণে এটা সম্ভব হয়েছে, প্রথমত ভারতচন্দ্র শেষ পর্যন্ত দেবীকে স্বরূপেই প্রকাশ করলেন। আর দ্বিতীয়ত, এখানে তিনি এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেন যা সমগ্র মধ্যযুগে একক মহিমায় অবস্থিত—যার মধ্যে দিয়ে বাঙালির প্রাণের স্বপ্ন-কামনার প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুতই ঈশ্বরী পাটনী কবির অসামান্য সৃষ্টি।

দেবীর ভবানন্দ ভবনে যাত্রার সময় আমরা প্রথম ঈশ্বরী পাটুনীর সাক্ষাৎ পেলাম। দেবীকে নদী পার হয়ে যেতে হবে ভবানন্দ-গৃহে। সেই লক্ষ্য নিয়ে দেবী :

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥

বোঝাই গেল ঈশ্বরী পাটুনীর জীবিকা ছিল খেয়া পারাপার করা। জীবনকে ভালবাসলে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা যে কত গভীর হতে পারে এই চরিত্রটির ব্যক্তিভাবনায় তা ধরা পড়েছে। নির্জন খেয়াঘাটের সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে দেবীকে দেখে ঈশ্বরী পাটনীর কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাঁর কল্পিত বর্ণনা দিয়েছেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু : "সন্ধ্যার অন্ধকারে একাকিনী "কুলকামিনী—গৃহত্যাগিনী কী? কেন? অপকর্মের উদ্ধত বা ভীত পদক্ষেপ তো নয়। দেখলেই কেমন ভাল লাগে, যেন ভক্তি হয়, মা বলতে ইচ্ছা করে, পরের ঘরে চলে-যাওয়া নিজের লক্ষ্মী প্রতিমার মতো মেয়েটির কথা মনে পড়ে। অব্যক্ত ব্যথায় পাটনীর বুক টনটন করে ওঠে, সে আনমনা হয়ে পড়ে, আহা, না জানি শ্বশুরবাড়িতে সে কেমন আছে? এই মেয়েটিও নিশ্চয় যন্ত্রণা সইতে না পেরে গৃহত্যাগ করেছে।...পাটনীর কষ্টবোধ হতে থাকে।...পাটনী আবার চিন্তিতও হয়—মেয়েটিকে দেখে তো বড় ঘরের বউ মনে হচ্ছে।" (*কবি ভারতচন্দ্র*, প্রথম দেজ সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৩, পৃ. ২০০৭) এই চিন্তা থেকে, যাতে কোনরকম ঝামেলায় পড়তে না হয় তাই পাটুনী দেবীর পরিচয় জানতে চায়। দেবী দ্ব্যর্থক ভাষায় নিজের পরিচয় প্রদান করেন। সমাজ-অভিজ্ঞ পাটুনী সব শুনে মন্তব্য করে :

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল॥

পাটুনী-কথিত এই দুটি চরণের মধ্যে ধরা আছে বাঙালি নারী জীবনের জীবন-যন্ত্রণার অকথিত

কাহিনী। পাটুনীর অভিজ্ঞতায় এ-রকম ঘটনার স্মৃতি হয়তো আরও আছে। তাই সে বলে :

শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল।

এর পরে দেবী ও পাটুনীর কথোপকথন—শহরীপ্রসাদ বসু যাকে 'দিব্য কাব্যনাট্য' বলেছেন। এই কথোপথনের মধ্যে পাটুনী চরিত্রের যেমন নানা দিকের প্রকাশ আছে, তেমনি আছে দেবী অন্নপূর্ণার স্নিগ্ধ রূপের অপরূপ ছবি। উদ্ধার করতেই হয় সেই সব অসামান্য পঙক্তিগুলি :

পাটুনী বলিছে মা গো বৈস ভাল হয়ে।
[দেবী নৌকোর বাইরে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন]
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে॥
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল॥
পাটুনী বলিছে মা গো শুন নিবেদন
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥
পাটুনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥

এখানে পাটুনীর চরিত্রে পিতৃস্নেহের (ঈশ্বরী পাটুনী স্ত্রী বা পুরুষ সে দ্বন্দ্বে আমবা যাচ্ছি না) একটা প্রচ্ছন্ন ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। যাত্রী নিরাপত্তার বিষয়টি মাঝিরা দেখে—কিন্তু এখানে বিষয়টি একটু বাড়তি মাত্রা পেয়েছে। হয়তো পাটুনী দেবীর মধ্যে নিজ-কন্যার ছায়া লক্ষ করে থাকবে তাই বেশি সতর্কতা—দেবীকে সেঁউতির ওপব পা রাখতে বলায় সেটাই প্রকাশ পেয়েছে। তবে কবির অন্য অভিপ্রায়ও ছিল। একটু পরেই তা বোঝা গেল

সেঁউতীতে পদ দেবী বাখিতে রাখিতে
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥

দেবী প্রকাশিত হলেন তাঁব অপরূপ করুণাময়ী মূর্তিতে। আব পাটুনী বুঝল :

সোনার সেঁউতী দেখি পাটুনীর ভয়।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥

সুতরাং এবার তো বর চাওয়ার মাহেন্দ্রক্ষণ—কারণ দেবী তো বলেছেন 'বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব'—কী বর চাইল ঈশ্বরী পাটুনী!

প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

কালকেতু দেবীর কৃপায় ঘড়াঘড়া মোহর পেয়েছে, রাজা হয়েছে—সেখানেই হয়তো সে জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে, এ কাব্যের হরিহোড়ও ধনসম্পদের পরিবর্তে জগজ্জননীর চরণাশ্রয় প্রার্থনা করেছে—হয়তো নিজের মোক্ষ লাভের উপায়ের কথা মনে রেখেই এই প্রার্থনা। ঈশ্বরী পাটুনীর কণ্ঠে কিন্তু উচ্চারিত হল অসাধারণ অথচ শতাব্দীর একান্ত বাস্তব প্রার্থনা : 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। কেন এই প্রার্থনা—কারণ মানুষ তো তার সন্তানদের মধ্যে নিজের জীবনের, নিজের বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পায়—তাই উত্তরপুরুষের বিঘ্নহীন জীবন তাব কাম্য যা প্রতিফলিত হয়েছে পাটুনীর প্রার্থনায় : 'আমার সন্তান যেন থাকে

দুধে ভাতে'। খ্রিস্টধর্মেও এরকমই প্রার্থনার কথা আছে : 'Give us this day our daily bread.' অষ্টাদশ শতকে ঈশ্বরী পাটুনীর এই প্রার্থনার পৃথক তাৎপর্য আছে। অন্নের জন্য হাহাকার এই শতকে তীব্র হয়ে উঠেছিল। কবির আরাধ্য অন্নপূর্ণা সকলকে অন্ন জোগান। অন্নের সেই সংকটের কালে ঈশ্বরী পাটনী তার আপনজনের জন্য অন্নপূর্ণার কাছে তো অন্নের প্রার্থনাই করতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হয় ঈশ্বরী পাটুনীর এ-প্রার্থনায় প্রতিফলিত হয়েছে সাধারণ বাঙালির আন্তস্তিক কামনা। সব মিলে তাই ঈশ্বরী পাটুনী সমগ্র মধ্যযুগে একক বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান।

আমরা চরিত্র আলোচনা করতে বসেছি—কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে চরিত্র-রচয়িতার কথা একটু বলে না নিলে এই আলোচনা পূর্ণতা পাবে না। শঙ্করীপ্রসাদ বসু জানিয়েছেন ভারতচন্দ্র কি হতে পারেন *অন্নদামঙ্গল*-এর শেষের এই কয় পৃষ্ঠা তার প্রমাণ। আমাদের মনে হয় ভারতচন্দ্র প্রকৃতই কি ছিলেন তারও হয়তো নিদর্শন শেষের এই কয়েক পৃষ্ঠা। শঙ্করীপ্রসাদ বসু বলেছেন : 'বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং অবস্থার এমন শুচিসুন্দর ছবি কোথায় পাব।...বাকচতুর ভারতচন্দ্র হারিয়ে গিয়ে পরিবর্তে কুলু কুলু পয়ার প্রবাহের আর এক ভগীরথ-কবিকে আমরা এখানে পাচ্ছি।" যে-কবি ছায়াব মতো ঈশ্বরী পাটুনী ও দেবীকে অনুসরণ করেছেন—জননী নায়ের বাড়ে পা নামিয়ে বসলে যে- শোভা নদীতে দেখা গেল তা-ও ধরা পড়েছে কবির বর্ণনায় :

বসিয়া নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ॥

দেবী ও ঈশ্বরী পাটুনীর ছায়াসঙ্গী কবি ঈশ্বরী পাটুনীর প্রতি নিজের ঈর্ষাও (অবশ্যই সদর্থে) প্রকাশ করে ফেললেন :

যার নামে পার করে ভবপারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটুনী তাহারে ঘরে পার॥

কবি আর নিজেকে অপ্রকাশিত রাখতে পারলেন না—বক্রতার কৃত্রিম আচ্ছাদন সরিয়ে ভক্ত-কবি নিজেকে প্রকাশ করে ফেললেন—সেই সঙ্গে দেখালেন বাঙালির চির-আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের করুণাময়ী দেবীর মমতাময় মুখখানি। আর এভাবেই বোধহয় *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে (প্রথম খণ্ডে) কবিও এক চরিত্র হয়ে যান।